সূচিপত্র

Section-B: Empirical Issues

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	জাতিসংঘ ব্যবস্থা	
অধ্যায়-০১	জাতিসংঘ	০২
	জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা	০৩
	জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা	১১
	জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা	১২
	শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব	১৩
	গণহত্যা (Genocide)	১৪
	সর্বজনীন মানবাধিকার (Universal Human Rights)	১৪
	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা	১৬
	পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ	১৭
	জাতিসংঘ মহাসচিব	১৮
	জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা	১৮
	জাতিসংঘ পানি চুক্তি	২০
	উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ	২০
	প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক	
অধ্যায়-০২	পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪
	যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক	২৮
	চীনের পররাষ্ট্রনীতি	৩০
	চীন-মার্কিন সম্পর্ক	৩১
	চীন-ভারত সম্পর্ক	৩৬
	চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক	৩৯
	চীন-ইরান সম্পর্ক	৪১
	চীন-আফ্রিকা সম্পর্ক	৪৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	
অধ্যায়-০৩	ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান	৫২
	ক. বিশ্বব্যাংক (World Bank)	৫২
	খ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	৫৬
	আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা	৬১
	ক. SWIFT	৬১
	খ. ADB	৬২
	গ. NDB	৬৫
	ঘ. AIIB	৬৭
	ঙ. IsDB	৬৮
	বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা	৬৯
	GATT ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	৬৯
	অর্থনৈতিক জোট	৭৪
	ক. BRICS	৭৪
	খ. G-20	৭৬
	গ. G-7	৭৬
	ঘ. D-8	৭৭
	আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	
অধ্যায়-০৪	RCEP	৮২
	সার্ক (SAARC)	৮৫
	বিমসটেক (BIMSTEC)	৮৯
	আসিয়ান (ASEAN)	৯১
	ওআইসি (OIC)	৯৪

সূচিপত্র

Section-B: Empirical Issues

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০৪	ন্যাটো (NATO)	৯৫
	এপেক (APEC)	৯৯
	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	১০১
	ওপেক (OPEC)	১০৩
	ওপেক প্লাস (OPEC Plus)	১০৪
বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব		
অধ্যায়-০৫	মধ্যপ্রাচ্য সংকট	১১০
	আরব বসন্ত	১১১
	মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি	১১২
	ক. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট	১১৫
	খ. ইরান সংকট	১২৩
	গ. সিরিয়া সংকট	১২৮
	ঘ. ইয়েমেন সংকট	১৩১
	রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট	১৩৪
	চীন-তাইওয়ান সংকট	১৪০
	দক্ষিণ চীন সাগর সংকট	১৪২
	সুদান সংকট	১৪৪
	ভেনেজুয়েলা সংকট	১৪৬
	ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ	১৪৭
	বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তু সমস্যা	১৪৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি		
অধ্যায়-০৬	দক্ষিণ এশিয়া	১৬০
	বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক	১৬০
	বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক	১৭১
	বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক	১৭৬
	ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট)	১৮৬
	আফগানিস্তান সংকট	১৯১
	চীন-ভারত দ্বন্দ্ব	১৯৩
	শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংকট, সংস্কার ও উত্তরণ	১৯৪
	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি	১৯৭
	দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিসমূহ	১৯৮
	দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	২০০
	ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি: দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক মেরুকরণ	২০১
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ		
অধ্যায়-০৭	পররাষ্ট্রনীতি	২১২
	বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	২২১
	আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও বাংলাদেশ	২২৬
	জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া	২৩২
	খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা	২৩৫
	LDC গ্র্যাজুয়েশন	২৩৬
	মডেল টেস্ট (১-৪)	২৪১

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Section B: Empirical Issues

ক্রমিক নং	বিষয়	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
০১.	জাতিসংঘ ব্যবস্থা	১	-	১	-	-	-	১	১	১	২	২	৯
০২.	প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক	১	১	-	-	-	-	৩	-	১	১	-	৭
০৩.	বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	-	-	১	-	-	-	১	-	১	৩	-	৬
০৪.	আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১	-	-	১	১	-	-	-	১	১	-	৫
০৫.	বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব	-	-	২	২	১	১	১	২	২	১	১	১৩
০৬.	দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি	১	১	১	২	২	৪	১	২	২	১	২	১৯
০৭.	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	১	২	-	-	১	১	১	২	-	-	১	৯
	মোট	৫	৪	৫	৫	৫	৬	৮	৭	৮	৯	৬	৬৮

অধ্যায় ০১

জাতিসংঘ ব্যবস্থা
(The United Nations System)

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. জাতিসংঘের কয়টি বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে? **World Intellectual Property Organization (WIPO)** এর মূল কাজসমূহ কী কী ও এর বাজেটের মূল উৎস কী? [৪৭তম বিসিএস]

০২. বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

০৩. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট ব্যবস্থায় ভেটো ক্ষমতার বিধান রাখার অন্তর্নিহিত যুক্তি কী? [৪৪তম বিসিএস]

০৪. সিডো **(CEDAW)**-এর গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৫. জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বলতে কী বোঝায়? [৩৮তম বিসিএস]

০৬. অভিবাসন ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক চিহ্নিত করুন। সামসময়িক বিশ্বব্যবস্থায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]

০৭. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য **(Millennium Development Goal)** এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন বিষয়ে ধারণা দিন। (সংক্ষেপে)। [৩৭তম বিসিএস]

০৮. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তিগুলো কী? [৩৬তম বিসিএস]

০৯. জাতিসংঘ সনদ **(UN Charter)** অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের **(Security Council)** গঠন ও মূল দায়িত্ব কী? [৩৫তম বিসিএস]

১০. সামসময়িক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্যের প্রতিফলনে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারসমূহের দাবি আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

১১. নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশের ভূমিকা লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]

১২. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন কোন সদস্যরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে? [৩২তম বিসিএস]

১৩. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা কত এবং বর্তমান (২০১১ সালে) কোন কোন দেশ এই পরিষদের অস্থায়ী সদস্য? [৩১তম বিসিএস]

১৪. জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে? জাতিসংঘ দিবস কবে? [৩০তম বিসিএস]

১৫. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানকারী দেশগুলোর নাম কী? [২৯তম বিসিএস]

১৬. **CEDAW**-এর পুরো নাম কী? [২৫তম বিসিএস]

১৭. **UNHCR** কী এবং এর সদর দপ্তর কোথায়? [২২তম বিসিএস]

১৮. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন। [২১তম বিসিএস]

১৯. জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন। [১৭তম বিসিএস]

২০. জাতিসংঘকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী তা বিবৃত করুন। [১৭তম বিসিএস]

২১. ভেটো ক্ষমতা কী? আপনি কি মনে করেন যে পূর্ব গঠিত জাতিসংঘ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের নীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত? যৌক্তিকতাসহ আলোচনা করুন। [১৫তম বিসিএস]

২২. জাতিসংঘকে আরও কার্যকরী ও বাস্তব সম্মত করার উদ্দেশ্যে আপনি কি সংস্থাটির সনদের কিছু সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন। [১৩তম বিসিএস]

২৩. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করুন। [১১তম বিসিএস]

২৪. টীকা লিখুন: (ক) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; [৩৩তম বিসিএস]
(খ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ; [৩১তম বিসিএস]
(গ) আন্তর্জাতিক বিচার আদালত; [৩১তম বিসিএস]
(ঘ) আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত; [৩০তম বিসিএস]
(ঙ) সিডো **(CEDAW)**; [২৯তম বিসিএস]
(চ) গণহত্যা নিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন; [২৫তম বিসিএস]
(ছ) **International Court of Justice**. [২৪তম বিসিএস]

জাতিসংঘ (United Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা মানবজাতিকে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে দারুণভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করে। এরই পটভূমিতে ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সংগঠন 'লীগ অব নেশনস' বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস' নানাবিধ কারণে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে এটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা মারাত্মক, কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। বিশ্বযুদ্ধের এ লোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা সমগ্র মানবজাতিকে আতঙ্কিত করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবতা, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরি হয় জাতিসংঘ। ৫১টি দেশ নিয়ে যাত্রা করা এ সংস্থাটি বর্তমানে ১৯৩টি দেশের সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

এক নজরে জাতিসংঘ

প্রতিষ্ঠা	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫
উদ্যোক্তা	৪টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও রাশিয়া)
সদর দপ্তর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
আঞ্চলিক সদর দপ্তর	জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), নাইরোবি (কেনিয়া)।
মূলমন্ত্র	এ পৃথিবী আমার
বর্তমান সদস্য	১৯৩টি দেশ
পর্যবেক্ষক দেশ	২টি (ভ্যাটিকান সিটি, ফিলিস্তিন)
জাতিসংঘ সনদ	১৯টি অধ্যায়, ১১১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে
মোট ভাষা	৬টি (ইংরেজি, রুশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চাইনিজ, আরবি)
মহাসচিব	এ পর্যন্ত ৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বশেষ- অ্যান্তোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)
চাঁদার হার	যেকোনো দেশ সর্বোচ্চ চাঁদা দিতে পারবে মোট বাজেটের ২৫%। বাংলাদেশের চাঁদার হার- ০.০১% (মোট বাজেটের)।

জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘ সনদ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন চুক্তি। এটি জাতিসংঘের লক্ষ্য, শাসন কাঠামো এবং সামগ্রিক কাঠামো নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চুক্তি হিসেবে এর নিয়ম এবং বাধ্যবাধকতাগুলো সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অন্য যে-কোনো চুক্তির উর্ধ্বে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রানসিসকো নগরীতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়।

প্রেক্ষাপট: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতার পর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ ৫০ টি দেশের প্রতিনিধিরা একাধিক পর্যালোচনা, বিতর্ক এবং সংশোধনের পর সনদের খসড়া অনুমোদন করেন, যা হবে ভবিষ্যতের একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত্তি। এই অনুমোদিত খসড়াটি 'জাতিসংঘ সনদ' নামে পরিচিত।

সনদের সারসংক্ষেপ: সনদে ১টি প্রস্তাবনা, ১৯টি অধ্যায় এবং ১১১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

- **প্রথম অধ্যায়:** জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে।
- **দ্বিতীয় অধ্যায়:** জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের মানদণ্ড
- **তৃতীয়-পঞ্চদশ অধ্যায়:** জাতিসংঘের অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিজ নিজ ক্ষমতার বর্ণনা আছে।
- **ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায়:** প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইনের সাথে জাতিসংঘকে একীভূত করার ব্যবস্থা বর্ণিত আছে।
- **অষ্টাদশ অধ্যায়:** সনদের সংশোধন।
- **ঊনবিংশ অধ্যায়:** সনদের অনুমোদন।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা এবং ১নং অনুচ্ছেদে তার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করা-[অনুচ্ছেদ-১(১)]
২. পৃথিবীর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা-[অনুচ্ছেদ-১(২)]
৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলি নিরসনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা [অনুচ্ছেদ-১(৩)]
৪. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা-[অনুচ্ছেদ-১(৪)]

জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ (Principles of the UN)

জাতিসংঘ সনদের ২নং অনুচ্ছেদে এর নীতিসমূহ বর্ণিত আছে। এগুলো হলো-

১. জাতিসংঘের সকল সদস্যের সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী।
২. সকল সদস্যই সনদের আনুগত্যের প্রতি অটল থাকবে।
৩. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করবে।
৪. কোনো সদস্য রাষ্ট্রই এমন কোনো কাজ করবে না যাতে অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা নষ্ট হয়।
৫. কোনো সদস্য রাষ্ট্রই অপর কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে কোনো ধরনের শক্তি প্রদর্শন বা হুমকি প্রদর্শন করবে না।
৬. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলিতে সার্বিক সহযোগিতা করবে।
৭. যে সমস্ত রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয়, তারা যাতে প্রয়োজনে জাতিসংঘের নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা

জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক এর উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ৬টি শাখা বা বিভাগ রয়েছে। জাতিসংঘ এ বিভাগসমূহের মাধ্যমে তার কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এগুলো হলো-

১. সাধারণ পরিষদ (The General Assembly);
২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council);
৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council);
৪. অছি পরিষদ (The Trusteeship Council);
৫. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice);
৬. জাতিসংঘ সচিবালয় (United Nations Secretariat)।

সাধারণ পরিষদ (The General Assembly)

জাতিসংঘের ৬টি শাখার মধ্যে সাধারণ পরিষদই সর্ববৃহৎ এবং অনন্য। সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত। এটিকে একটি আইন পরিষদ বা আলোচনা পরিষদ (Discussion body) বলা যেতে পারে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ৫ জন করে প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে পাঠাতে পারে। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটাধিকার থাকবে। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। একে বিশ্বের মহাসভা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয়। প্রয়োজনবোধে জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধে সেক্রেটারি জেনারেল ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাধারণত প্রতিবছর আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ- এই পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এখানে একজন সভাপতি, ২১ জন সহ-সভাপতি ও ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারম্যানদের নিয়ে আবার একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে যেকোনো সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি (Functions of the General Assembly)

- নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা ও সুপারিশ করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা, তবে শর্ত থাকে যে, বিষয়টি নিয়ে ইতঃপূর্বে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়নি, এবং বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীনও নয়।
- জাতিসংঘের যেকোনো অঙ্গ সংগঠনের কাজ বা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ও সুপারিশ পেশ করা।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে যেকোনো সুপারিশ পেশ করা, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সবার জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ করা।
- নিরাপত্তা পরিষদসহ সংগঠনের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের প্রতিবেদন গ্রহণ করা ও সেই প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা।
- জাতিসংঘের বাজেট নিয়ে আলোচনা ও তা অনুমোদন করা। সদস্য দেশগুলোর চাঁদার হার নির্ধারণ করা।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করা।
- নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যদের নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘের জন্য একজন মহাসচিব নির্বাচিত করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এমন কোনো কাজে বা দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ পদক্ষেপ নিতে পারে।
- নতুন সদস্যগ্রহণ এবং বহিষ্কারের সুপারিশ করা।
- Uniting for Peace Resulation-এর আওতায় বিশেষ জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা।

প্রতিবছরের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয়, এবং তা চলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রতিটি নিয়মিত অধিবেশনের আগে একজন সভাপতি, ২১ জন সহ-সভাপতি ও পরিষদের ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারম্যানরা নির্বাচিত হন। প্রধান কমিটিগুলো নিম্নরূপ:

- নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি (প্রথম কমিটি)।
- অর্থনীতি ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি)।
- সামাজিক, মানবকল্যাণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি (তৃতীয় কমিটি)।
- বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি)।
- প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয়ক কমিটি (পঞ্চম কমিটি)।
- আইন বিষয়ক কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)।

সাধারণ পরিষদের মূল্যায়ন (Evaluation of the General Assembly)

সাধারণভাবে সংখ্যাধিক্যের ভোটেই যেকোনো সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় গৃহীত হয়ে থাকে। ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, চীনা, স্পেনীয় ও আরবি-এ ৬টি ভাষায় সাধারণ সভায় সমস্ত আলোচনা এবং কাজকর্ম চলে। গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে সাধারণ সভার ক্ষমতা ও প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও ৬০-এর দশক থেকে তার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। সোভিয়েত-উত্তর স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর মার্কিন প্রভাবাধীন এক-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় সাধারণ সভাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার অপপ্রয়াস অব্যাহত আছে। সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাধ্যতামূলক নয়; তবুও বৃহত্তর বিশ্বের জোরালো সমর্থন থাকায় সেগুলোর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতাও কোনো অংশে কম নয়। সাধারণ সভার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (Epitome of the World) পরিলক্ষিত হয়। শুরুতে ৫০টির মতো রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ (General Assembly) আত্মপ্রকাশ করলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা ১৯৩-এ উপনীত হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মুখ্য দায়িত্ব এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে বলে একে নিরাপত্তা পরিষদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র পরিষদ। সাধারণ পরিষদের ন্যায় এত বৃহৎ সংস্থার পক্ষে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মতো গুরুদায়িত্ব একা পালন করা কোনো অবস্থায়ই সম্ভব নয়। সাধারণ পরিষদকে সম্মিলিত জাতিসংঘের আইনসভা বলা হলে নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যত জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা যায়। জাতিসংঘের ৬টি শাখার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন

জাতিসংঘ সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালি বর্ণিত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। এ ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য এবং বাকি ১০ জন অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্যগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ১০টি অস্থায়ী সদস্যের আঞ্চলিক বণ্টন এ রকম-

অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা	অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা
এশিয়া মহাদেশ	২টি	পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২টি
আফ্রিকা মহাদেশ	৩টি	পূর্ব ইউরোপ	১টি
ল্যাটিন আমেরিকা	২টি		

ভোট ও প্রস্তাব পাশ: নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে ভোট রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রস্তাব পাস করতে হলে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন হয়। কোনো স্থায়ী সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তবে, স্থায়ী কোনো সদস্য যদি উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকে তাহলে প্রস্তাব পাশ হবে। কিন্তু উপস্থিত না থাকলে প্রস্তাব পাশ হবে না।

ভেটো প্রদান ক্ষমতা: 'ভেটো' শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে আমি মানি না। ভেটো হচ্ছে এক-পক্ষীয়ভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দেশের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত বা আইনের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স-এই পাঁচটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তারা প্রত্যেকেই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। 'ভেটো' ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে যে-কোনো একটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত যে-কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন অনুমোদনে বাধা প্রদান করতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব জাতিসংঘ সনদের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২তম অধ্যায় তথা ২৪, ২৫, ২৮, ৩০ এবং ৪০-৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এর দায়িত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব:** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সকল সদস্যের পক্ষ হতে এ দায়িত্ব পালন করবে।

২. **শান্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:** আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টিকারী যেকোনো সমস্যা বা অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং তার মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব। যদি কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে যেকোনো সদস্য দেশ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বা জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে তা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারে। জাতিসংঘের সদস্য নয় এরূপ কোনো দেশ বা গোষ্ঠীর সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করতে পারে। তবে পূর্বে ঐ দেশকে অবশ্যই জাতিসংঘের সনদ বর্ণিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে হবে।

৩. **শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব:** কোথাও শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা গেলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪. **অর্থনৈতিক অবরোধ:** আগ্রাসনকারী দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক অবরোধসহ অন্যান্য অবরোধ এমনকি প্রয়োজনে বল প্রয়োগে সে দেশকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

৫. **সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ:** অন্যান্য ব্যবস্থা অকৃতকার্য হলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সকল সদস্য দেশ নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকে।

৬. **আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বিষয়ক দায়িত্ব:** বন্দোবস্তের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য উৎসাহ দান এ পরিষদের একটি দায়িত্ব। বিরোধের সাথে জড়িত রাষ্ট্রের উদ্যোগে বা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বা এজেন্সির মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা যায়। আবার নিরাপত্তা পরিষদ নিজের কর্তৃত্বাধীনে কোনো শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক সংগঠন বা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

৭. **অছি বিষয়ক দায়িত্ব:** যে সকল অছি এলাকা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, সম্পদের উপর অধিকার স্থাপন, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব স্থাপন, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অছি পরিষদের নিকট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা নিতে পারে।

৮. **নতুন সদস্য গ্রহণ:** জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণত সবার সাথে যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৯. **নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব:** নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন করে থাকে। এ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নির্বাচন করে থাকে।

১০. **সনদ সংশোধন:** শুধু নিরাপত্তা পরিষদই জাতিসংঘ সনদ সংশোধন, পরিমার্জন বা নতুন আইন অন্তর্ভুক্তকরণ করতে পারে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো' ক্ষমতা

দীর্ঘ ছয় বছর (১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। বিজয়ী মিত্রশক্তি পরবর্তীকালে যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করা যায় এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। তখন বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে এখনও প্রতিফলিত হয়ে চলছে। উদাহরণস্বরূপ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে কোনো প্রস্তাব তোলা হলে পাঁচটি দেশের যেকোনো একটি তার ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রস্তাবটি আটকে দিতে পারে। অন্যসব দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও কোনো কাজ হয় না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার যুক্তি মূলত স্থায়ী সদস্যদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। তারা মনে করে যে শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই সম্ভব যদি বৃহৎ শক্তিগুলো একসাথে কাজ করে। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতা রাখার যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন সেগুলো হলো-

১. ভেটো ক্ষমতা ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন।
২. যদি স্থায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় তবে জাতিসংঘ ভেঙে যেতে পারে।
৩. স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে এটি নিরাপত্তা পরিষদকে বাধা দেয়।

পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যদেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স বেসামরিক মানুষকে রক্ষার চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ বা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশের মধ্যে USA সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয়। এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, একারণেই তারা সবসময় ভেটো পাওয়ার পেতে চায়। আবার, বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়েও এই পাঁচটি দেশই সবচেয়ে শক্তিশালী। একারণেই তারা সবসময় ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা চায়। মূলত ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এসব দেশ তাদের আধিপত্য সবসময় বিস্তার রাখতে চায় তাই তারা ভেটো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চায় না।

নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের শাসন বিভাগ (Executive Body) হিসেবে চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বহুলাংশে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সংগত কারণে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি এরূপ হওয়া দরকার ছিল, যাতে কোনো অবস্থাতেই ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার হয়েছে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদকে তথা জাতিসংঘকে দুর্বল করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে একে একটি অকার্যকর সংগঠনে পরিণত করেছে। ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতার কারণে বৃহৎ পঞ্চশক্তি যে বিষয়ে একমত হয়, কেবল সে বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। বিশ্বের সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্য মাপকাঠি ধরা হলেও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটিমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগের ফলে অবশিষ্ট ৪টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র ও ১০টি অস্থায়ী সদস্যের মতামত বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফলে এ ভেটো ক্ষমতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার যে দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনে পরিষদ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বৃহৎ শক্তির মদদপুষ্ট কোনো বিরোধের মীমাংসা নিরাপত্তা পরিষদ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলি তার প্রমাণ। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ফলে ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগ। স্থায়ী দেশগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় নিরপেক্ষতা নষ্ট হচ্ছে। যেমন: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার ভেটো। বর্তমানে মোট সদস্য ১৫টি (৫ স্থায়ী + ১০ অস্থায়ী) রয়েছে; যা বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্বের জন্য অপ্রতুল। অস্থায়ী সদস্যদের প্রভাব সীমিত, কারণ স্থায়ী সদস্যদের ভেটোই চূড়ান্ত। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার অনেক বৃহৎ দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নেই।

উদাহরণস্বরূপ-

১. রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ জাতিসংঘ নিতে পারেনি।
২. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।
৩. চলমান ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
৪. গণচীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরপরই জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি।
৫. সিরিয়ায় আসাদ সরকারের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি।
৬. ইয়েমেনে হুতিদের নৃশংসভাবে সৌদি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক।
৭. ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়ার উপর আক্রমণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক বতসোয়ানা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের উপর আক্রমণের নিন্দা প্রস্তাব মার্কিন ভেটোর কারণে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়নি।
৮. জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালির পুনর্নির্বাচন মার্কিন ভেটোর কারণে সম্ভব হয়নি।
৯. কোরিয়া যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ প্রভৃতি বহু ঘটনার নিষ্পত্তি কেবল ভেটোর কারণে বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশসমূহ

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। এ লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (UN Security Council), যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গ। এই পরিষদে ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে- যার মধ্যে ৫টি স্থায়ী (Permanent Members) এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য (Non-Permanent Members)। অস্থায়ী সদস্যদের কার্যকালীন সময়ের মধ্যেই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইস্যুতে অবস্থান নিতে হয়, যার ফলে তাদের নীতিগত ও কূটনৈতিক দক্ষতা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। অতএব, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশসমূহ, যদিও ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন নয়, তথাপি তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশীদার।

ভূমিকা ও কার্যাবলি

১. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অংশগ্রহণ:** অস্থায়ী সদস্যরা জাতিসংঘ চার্টারের অধীনে শান্তি রক্ষার প্রশ্নে প্রস্তাব পেশ, আলোচনা ও সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, সিরিয়া, ইয়েমেন বা সুদান ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে তাদের মতামত গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে।

২. **ভোট প্রদান ও প্রস্তাব গৃহীততে ভূমিকা:** নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ১৫টি ভোটের মধ্যে অন্তত ৯টি প্রয়োজন হয়, যেখানে অস্থায়ী সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভোটদাতা। যদিও ভেটো নেই, তাদের সম্মিলিত ভোটে একটি প্রস্তাব পাশ বা ব্যর্থ করাতে পারে।

৩. **খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন দেওয়া:** অস্থায়ী সদস্যরা নিজেরা খসড়া প্রস্তাব পেশ করতে পারে বা অন্য সদস্যদের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করে। যেমন, বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে অস্থায়ী সদস্য থাকাকালে আফগানিস্তান ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়েছিল।

৪. **আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্বার্থের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা:** বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তারা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রশ্নে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যাতে বৈচিত্র্যময় মতামত প্রতিফলিত হয়।

৫. **শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণে মতামত ও অনুমোদন:** শান্তিরক্ষী মিশন পরিচালনায় সদস্য রাষ্ট্রদের সম্মতি প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী সদস্যরা এই মিশন পরিচালনার নীতিগত ও বাস্তবিক দিক পর্যালোচনায় অংশ নেয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের (UN Peacekeeping Missions) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অস্থায়ী সদস্যদের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রস্তাবকে সমর্থন বা বিরোধিতা করে এবং শান্তিরক্ষীদের অবস্থান ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে মতামত দেয়। যেমন: বাংলাদেশ ২০০০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য থাকাকালে কসোভো ও পূর্ব তিমুরে শান্তিরক্ষা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৬. **মানবিক সংকট ও দ্বন্দ্বে কূটনৈতিক উদ্যোগ:** জাতিগত নিধন, গণহত্যা বা মানবিক বিপর্যয়ের সময় তারা মধ্যস্থতা, অবরোধ বা নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপে সমর্থন বা বিরোধিতা করে, যার রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। যেখানে যুদ্ধ বা জাতিগত সহিংসতা মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, যেমন সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান বা গাজা সংকট- সেসব বিষয়ে অস্থায়ী সদস্যরা মানবিক সহায়তা প্রদানের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং যুদ্ধাপরাধ বন্ধে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে।

৭. **জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমন্বয় সাধন:** অস্থায়ী সদস্যরা UNGA, ECOSOC বা ICJ-এর মতো অন্যান্য অঙ্গের কার্যক্রম সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করে ও যৌথ সিদ্ধান্তে সাহায্য করে।

৮. **শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব ও প্রস্তাবের সমর্থন:** অস্থায়ী সদস্য দেশসমূহ নিজেরা শান্তি-সম্পর্কিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে বা অন্য সদস্যদের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে একজোট হতে পারে। কখনো কখনো এটি শান্তির পক্ষে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা রাখে।

অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তা পরিষদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এককভাবে ক্ষমতাবান না হলেও, তারা একটি নৈতিক, কূটনৈতিক এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য আনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিরাপত্তা পরিষদের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। বিশ্ব রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ কেবল ক্ষমতার প্রয়োগ নয়, বরং দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণের প্রতিচ্ছবি, যা জাতিসংঘের মৌলিক উদ্দেশ্য-শান্তি, ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-বাস্তবায়নে সহায়ক।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার

জাতিসংঘ সনদের ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘ গঠন ও কার্যপ্রণালি নির্ধারিত হয়। ১৯৬৫ সালের পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার বৈঠক। ভারত, জার্মানি ও জাপান এই বৈঠকে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পরও সংস্থাটির কার্যকারিতায় কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই সংস্কার করা জরুরি। যেসব বিষয়ের কারণে সংস্কার হওয়া জরুরি-

১. **নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি:** নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা মাত্র ৫টি। দেখা যায় এখানে প্রায় ৭৫ কোটি মানুষের ইউরোপ মহাদেশ থেকে ৩টি সদস্য, আর প্রায় ৪৮৪ কোটি মানুষের মহাদেশ এশিয়া থেকে স্থায়ী সদস্য ১টি এবং প্রায় ১৫৫ কোটি মানুষের মহাদেশ আফ্রিকার কোনো স্থায়ী সদস্যই নেই। তাই সংস্কার করে মহাদেশভিত্তিক প্রতিনিধি বৃদ্ধি জরুরি।

২. **সদস্যের অনুপাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি:** ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার সময় জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১টি আর তখন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১টি তার মধ্যে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী। ১৯৬৫ সালে প্রথম সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা করা হয় ১৫টি। বর্তমানে জাতিসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি। দীর্ঘ প্রায় ৬৮ বছর যাবৎ জাতিসংঘের সবচেয়ে কার্যকর এ পরিষদের তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৩. **নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে মুসলিম দেশের প্রতিনিধি রাখা:** নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মুসলিমের মধ্যে একটি দেশেরও প্রতিনিধিত্ব নেই। তাই সংস্কার করে মুসলিম কোনো দেশকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া উচিত।

৪. **ভেটোর সংস্কার:** বর্তমান ভেটো পদ্ধতিতে স্থায়ী সদস্যের কোনো একটি সদস্য আপত্তি জানালেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এটিকে সংস্কার করে সংখ্যার সীমাবদ্ধতায় নিয়ে আসা উচিত। যেমন, দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ ভোটের ভিত্তিতে পাশ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫. **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের একমাত্র ক্ষেত্র হলো সাধারণ পরিষদ। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ একমাত্র সাধারণ পরিষদেই সর্বজনীনভাবে অংশ নিতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের ভেটোর কারণে সাধারণ পরিষদ তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। এ কারণেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে আরও কার্যকর করা দরকার।

৬. **মহাসচিবের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিবের যেরূপ ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন ছিল, তা মহাসচিবের নেই। নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এছাড়া বৃহৎ শক্তিগুলোর বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার মোকাবিলায় তিনি চরমভাবে ব্যর্থ। তাই জাতিসংঘ সনদের সংস্কারের মাধ্যমে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৭. **শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধির মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অশান্তি আর আধিপত্যবাদ তা মিথ্যা প্রমাণ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পৃথিবীকে তাদের নিজ স্বার্থে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং সত্তর কিংবা আশির দশকের পর হতে দেশে দেশে জাতিগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের যে উত্থান তা মোকাবিলায় জাতিসংঘের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছে না। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের National Interest এর থেকে Collective Interest কে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া।

৮. **ত্রুটিপূর্ণ চাঁদা পদ্ধতি:** বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৈধ রাজনৈতিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা রয়েছে। জাতিসংঘের প্রধান আয় হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশের চাঁদার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সংস্থাটি এদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রীতিমতো চাঁদা পরিশোধ না করায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও জাতিসংঘের সংস্কার আবশ্যক।

৯. **মার্কিন সাহায্য নির্ভরতা:** জাতিসংঘের বাজেটের এক-চতুর্থাংশই দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর মোট খরচেরও এক-চতুর্থাংশ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এসব কারণে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের মার্কিন সাহায্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে জাতিসংঘ হুমকির মুখে পড়বে। তাই সংস্কারের মাধ্যমে জাতিসংঘে মার্কিন নির্ভরতা কমাতে হবে। ২০১৮ সালে জেরুজালেম ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাঁদা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল।

১০. **ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাস:** ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাসকল্পে ভেটো প্রাপ্ত কোনো সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ী হলে ভেটো সিদ্ধান্ত অকার্যকর হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রস্তাবসমূহ

১. **বুট্রোস ঘালির উদ্যোগ:** ১৯৯২ সালে ড. বুট্রোস ঘালি মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পরই জাতিসংঘ সংস্কারের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১৭ জানুয়ারি জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাতিসংঘকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য 'An Agenda for Peace' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এই প্যানেল দুটি সংস্কার মডেল উপস্থাপন করে-

এক নজরে সংস্কার প্যানেল

প্রথম মডেল	■ নতুন স্থায়ী সদস্য হবে ৬টি যাদের ভেটো ক্ষমতা থাকবে না। ■ ৬টির মধ্যে এশিয়া থেকে ২টি, আফ্রিকা থেকে ২টি, ইউরোপ থেকে ১টি ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ১টি। ■ ২ বছর মেয়াদি অস্থায়ী সদস্য আরও নতুন ৩টি বৃদ্ধি পাবে। ■ নতুন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে ২৪টি। ■ আরব বিশ্ব থেকে একটি স্থায়ী সদস্যের পরিকল্পনা রয়েছে।
দ্বিতীয় মডেল	■ ৪ বছরের জন্য ৮টি নতুন সদস্য হবে তবে তা নবায়নযোগ্য। ■ আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে ২টি করে সদস্য থাকবে। ■ ২ বছর মেয়াদে একটি অস্থায়ী সদস্যপদের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. **কফি আনানের প্রস্তাব:** ২০০৫ সালের ২০ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান একবিংশ শতকে বিশ্বের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘ যাতে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটির এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। কফি আনান বলেন, বৃহৎ শক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সংস্থাটির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কফি আনান প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাবে দুটি মডেল উল্লেখ করেন-

মডেল-A		
ভৌগোলিক এলাকা	প্রস্তাবিত নতুন স্থায়ী আসন	প্রস্তাবিত অস্থায়ী ২ বছরের আসন
আফ্রিকা	২	৪
এশিয়া-প্যাসিফিক	২	৩
ইউরোপ	১	২
আমেরিকা	১	৪
সর্বমোট	৬	১৩

মডেল-B		
ভৌগোলিক এলাকা	প্রস্তাবিত নতুন স্থায়ী সদস্য	প্রস্তাবিত অস্থায়ী সদস্য
আফ্রিকা	২	৪
এশিয়া প্যাসিফিক	২	৩
ইউরোপ	২	১
আমেরিকা	২	৩
সর্বমোট	৮	১১

[Source: UN Department of Public Information]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক শাখা। বিশ্বমানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে সুখী, সুন্দর ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন প্রণালি

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন। এর কার্যকাল ৩ বছর। এ পরিষদের সদস্যরা ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতিবছর ১৮টি সদস্য দেশ অবসর গ্রহণ করে এবং ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। বছরে অন্তত ৩ বার এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। প্রয়োজনবোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে এ পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপক কার্য সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে অনুন্নত জাতিগুলোর

দ্বিতীয়ত : জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মানব কল্যাণ সাধনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

তৃতীয়ত : এ পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করে। অন্যান্য সংস্থাসমূহকে এর অধিবেশনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

চতুর্থত : এ পরিষদ আপন দায়িত্ব পালনের জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে, সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাঠায়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কাছ থেকে এর সুপারিশমালা কার্যকর করার ব্যাপারে প্রতিবেদন চায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মূল্যায়ন: অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কমিটি, কমিশন ও অধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিষদ বিভিন্ন এজেন্সি ও সংস্থার কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের কাজও করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থাসমূহের নিকট থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে এবং মন্তব্য ও সুপারিশ সহকারে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করে। ১৫টি বিশেষ সংস্থা, ১২৮টি কমিশন ও ৫টি সাবকমিশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

এক নজরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন

কমিশন	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য সংখ্যা
আফ্রিকা অর্থনৈতিক কমিশন (ECA)	১৯৫৮	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া	৫৪
ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE)	১৯৪৭	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৫৬
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECLAC)	১৯৪৮	সান্তিয়াগো, চিলি	৪৬ (সহযোগী-১৪)
এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)	১৯৪৭	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	৫৩ (সহযোগী-৯)
পশ্চিম এশীয় অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCWA)	১৯৭৩	বৈরুত, লেবানন	২১

অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)

সম্মিলিত জাতিসংঘের অছি পরিষদ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সংস্থা বা পরিষদ। অছি এলাকা (অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সার্বভৌমত্বহীন পৃথক জনপদ) সমূহের শাসন, তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই অছি পরিষদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অছি রাষ্ট্র বা এলাকাসমূহের বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই অছি পরিষদ গঠিত হয়েছে।

অছি এলাকা (Trusteeship Council): জাতিসংঘ সনদে অছি এলাকা বলতে এক বিশেষ ধরনের এলাকা বা রাষ্ট্র বোঝায়। যে জনপদ বা এলাকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই, কিন্তু পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, এরূপ এলাকাকে অছি এলাকা বলা হয়। তিন প্রকার এলাকা নিয়ে অছি এলাকা আওতাভুক্ত রয়েছে। যথা-

- যে সমস্ত এলাকা লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন সময়ে পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এলাকা এবং
- চুক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন অছি এলাকা।

বর্তমান অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিতের কারণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে জাতিসংঘের অধীনে অছি পরিষদ গঠন করা হয়। বর্তমানে অছি পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। ১৯৯৪ সালে পালাউ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দানের মধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম স্থগিত হয়।

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক আদালত হচ্ছে সম্মিলিত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারালয়। আন্তর্জাতিক আদালত লীগ অব নেশনস এর স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আদালতের অধিবেশন প্রয়োজনবোধে যেকোনো স্থানে বসতে পারে।

আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনপ্রণালি

আন্তর্জাতিক আদালত ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে ৯ বছরের জন্য গঠিত হয়। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচিত করে। বিচারকরা একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতেই নির্বাচিত হন। কোনো প্রকার জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। তবে একই রাষ্ট্রের একসঙ্গে দু'জন বিচারক নির্বাচিত হতে পারবেন না। মেয়াদান্তে বিচারকগণ পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে ৩ বছরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। আদালতের কার্যক্রমে ৯ জন বিচারপতির উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হয়। যেকোনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা। আদালত কোনো ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনা করে না। শুধু বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিক্রমেই আন্তর্জাতিক আদালত কোনো মামলা পরিচালনা ও রায় প্রদান করে থাকে। আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর করে। নিম্নে আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

১. **আবেদনমূলক বিষয়ে এখতিয়ার বা কার্যাবলি:** জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি অপর কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং সে বিষয়ে ন্যায়সংগত মীমাংসার জন্য আবেদন করে, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়সংগত রায় প্রদান করে থাকে।
২. **জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে এখতিয়ার:** জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত উক্ত বিরোধের আইনগত মীমাংসা প্রদান করে তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
৩. **সন্ধি বা চুক্তিবিষয়ক কার্যাবলি:** জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সম্মতিক্রমে আদালত এর যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।
৪. **উপদেশমূলক এখতিয়ার:** আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক যেকোনো বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট উপদেশ কামনা করে তাহলে আদালত উক্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানে এগিয়ে আসে।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ অথবা জাতিসংঘের শর্তাধীন যেকোনো মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত রায় প্রদান করতে পারে। কিন্তু রায় কার্যকর করার কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কার্যকর করে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে এবং এ রায় সঠিকভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সীমাবদ্ধতা

- **অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি:** এ আদালতে রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন অভিযোগ দায়ের করতে পারে না। রাষ্ট্রে বিবেচ্য বিষয় গৃহীত হয়।
- **বাদী ও বিবাদী পক্ষ:** যেকোনো অভিযোগে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকেই থাকতে হয়। বিবাদী পক্ষকে রাজি করে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে হয়।
- **রায় বাস্তবায়ন:** আন্তর্জাতিক আদালত অনীহা প্রকাশ করলে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে এই রায় বাস্তবায়নের জন্য নিরপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সংস্কার ও সুপারিশ

- **বিচারক নিয়োগ:** National Panel-এর মাধ্যমে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রভাবমুক্ত বিচারক নিয়োগ।
- **রায় বাস্তবায়ন:** National Panel-এর ওপর অনীহার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ওপর সাধারণ পরিষদের ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
- **পুনর্নির্বাচন:** ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল এবং বিভিন্ন প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করা থেকে আন্তর্জাতিক আদালতকে বিরত রাখতে হবে।
- **বিবাদী পক্ষ:** অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সংশোধন করতে হবে। বাদী-বিবাদী উভয়ের অভিযোগ শুনে নিরপেক্ষ রায় দিতে হবে।

জাতিসংঘ সচিবালয় (Secretariat or Editorial Office)

জাতিসংঘ সচিবালয় হলো সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক শাখা বা বিভাগ। জাতিসংঘের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম ও বিভিন্ন বিভাগ, এজেন্সি ও সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত। সচিবালয়ের দক্ষতা ও কর্ম প্রচেষ্টার ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা তথা সম্মিলিত জাতিসংঘের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে বলা যায়।

জাতিসংঘ সচিবালয়ের গঠন

একজন সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব এবং তার দ্বারা নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে সচিবালয় সম্পাদকীয় দপ্তর গঠিত। সচিবালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক জাতিসংঘের মুখপাত্র সেক্রেটারি জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সচিবালয়কে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও আন্ডার সেক্রেটারি থাকেন। সচিবালয় স্বপদে পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন।

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হলো জাতিসংঘের অধিভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, খাদ্য, অর্থনীতি ও মেধাস্বত্বসহ নির্দিষ্ট বৈশ্বিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে কাজ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **International Labour Organization (ILO):** বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা, ন্যায্য কর্মপরিবেশ ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করা।
- **World Health Organization (WHO):** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধে নেতৃত্ব প্রদান করা।
- **United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):** শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে শান্তি ও মানব উন্নয়ন করা।
- **World Intellectual Property Organization (WIPO):** বিশ্বব্যাপী মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করা।

WIPO

জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা, যার প্রধান লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বয় ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এর প্রধান কাজগুলো হলো-

১. আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব নিবন্ধন ব্যবস্থা পরিচালনা।
২. মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা প্রণয়ন ও হালনাগাদে সহায়তা করা।
৩. উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।
৪. বৈশ্বিক মেধাস্বত্ব প্রবণতা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ প্রকাশ।
৫. মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধে মধ্যস্থতা ও সালিসি সেবা প্রদান।

WIPO এর বাজেটের মূল উৎস

WIPO এর বাজেট মূলত ফি-ভিত্তিক সেবা থেকে অর্জিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। সংস্থাটির মোট আয়ের প্রায় ৯৫-৯৬ শতাংশ আসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব নিবন্ধন ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়কৃত ফি থেকে। এই প্রধান আয়ের উৎসগুলো হলো-

- আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ ফি (Patent Cooperation Treaty)।
- আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন ফি।
- শিল্প নকশা নিবন্ধন ফি।
- ভৌগোলিক নির্দেশক ও উৎসের নাম নিবন্ধন ফি।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিয়মিত চাঁদা।
- বিভিন্ন স্বেচ্ছা অনুদান।

জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের সফলতা

- **শান্তিরক্ষা মিশন:** জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশন একটি বিশাল সফলতা। শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ যুদ্ধে আক্রান্ত দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা করে চলেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এ পর্যন্ত ৭১টি শান্তি মিশনের [১১টি চলমান (জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত)] মাধ্যমে-
  ১. ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধ বন্ধ করা;
  ২. ১৯৫০ সালে কোরিয়া সংকট মোকাবিলা;
  ৩. ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট মোকাবিলা;
  ৪. ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করা;
  ৫. ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত সংকট মোকাবিলা।
- **উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** জাতিসংঘ কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এল সালভাদর, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিমুর-লেস্তেসহ ৪৫টি দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ প্রায় ৫০টি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার ৩০ বছরব্যাপী সংঘর্ষের পর ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে এবং সুদানের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন:** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের পর রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত ৮০টি চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **নারী-পুরুষ বৈষম্যরোধ:** ১৯৭৯ সালে CEDAW (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) প্রতিষ্ঠা হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৮১ সালে।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:** জাতিসংঘ UNDP, UNICEF, ECOSOC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ECOSOC-এর মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে এবং এসব কার্যক্রমে ECOSOC, ১৫টি বিশেষ সংস্থা ও বিভিন্ন কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:**
  ১. UNFCCC-এর অধীনে প্রতিবছর জলবায়ু বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলন (COP) আয়োজন করে থাকে।
  ২. ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোয় জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
  ৩. ২০০২ সালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ।
  ৪. প্যারিস সম্মেলনে-১৯৬টি দেশ পরিবেশের উন্নয়ন ও কৌশলপত্র নিয়ে আলোচনা করে।
- **পরমাণু বিস্তার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি:** ১৯৫৭ সালে IAEA, ১৯৬৮ সালে NPT, ১৯৯৬ সালে CTBT (৯০টি দেশে পরমাণু চুল্লি পরিদর্শন করে)।
- **আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বনির্ভরতা:** জাতিসংঘ প্রায় ৮০টি সদস্যদেশের স্বনির্ভরতা অর্জনে ভূমিকা পালন করে।
- **আন্তর্জাতিক আইন জোরদার:** তিন শতাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার সনদ থেকে মহাকাশ ও সমুদ্র তলদেশে পরমাণু সরঞ্জাম ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি:** ইরানের পরমাণু চুক্তি।
- **বর্ণবৈষম্যের অবসান:** সাধারণ পরিষদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **উন্নয়নে অবদান:** MDG, SDG, UNDP প্রতিষ্ঠা।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

জাতিসংঘকে অনেকেই কাগুজে বাঘ বলে থাকেন। কারণ, জাতিসংঘের অনেক কার্যাবলি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের ভেটো পাওয়ারের কাছে অসহায় ও সীমাবদ্ধ। পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদেশের স্বার্থের বাইরে জাতিসংঘ কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনা। প্রত্যেকটি স্থায়ী সদস্য পারমাণবিক শক্তির অধিকারী এবং তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় বিশ্বে অনেক কিছু সংঘটিত হয়। তাদের অঙ্গুলি নির্দেশে বিশ্বের কূটনীতি ও রাজনীতি আবর্তিত হয়। তাছাড়া, জাতিসংঘ মূলত বৃহৎ শক্তিধর দেশের চাঁদায় পরিচালিত এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চাঁদা দানকারী দেশগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য বিশ্ব শান্তি-প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ অনেক সময় বৃহৎ পাঁচ স্থায়ী সদস্যদের কাছে অসহায়বোধ করে।

- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থতা:** রাশিয়া-ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ থামানোর জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও পঞ্চশক্তির ভেটো ক্ষমতায় তা ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘ এ সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে সারা বিশ্ব এখন এর ফল ভোগ করছে।
- **রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বাংলাদেশ ১১.৫ লাখ রোহিঙ্গাদের বহন করে চলছে। জাতিসংঘের প্রতিটি অধিবেশনে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যা উত্থাপন করলেও জাতিসংঘ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এখনো যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

- **কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি জাতিসংঘ। কাশ্মীর নিয়ে এখনো ভারত, চীন ও পাকিস্তানের মাঝে দ্বন্দ্ব চলমান।
- **গণহত্যা রোধে ব্যর্থতা:** সুদান, রুয়ান্ডা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া এবং বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা রোধে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।
- **মানবাধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থতা:** বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিসংঘের নীরব বা প্রত্যক্ষ ভূমিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অনেক দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। যেমন-ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করায় খাদ্য ও ঔষধের অভাবে শিশুমৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রেখেছে, যা বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছে।
- **মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:**
  - **মধ্যপ্রাচ্য:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অধিকৃত ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেওয়া কিন্তু ইসরায়েল ছাড়েনি। নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে-
    ১. ইরান-ইসরায়েল সংকট (২০২৫)।
    ২. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট।
    ৩. সিরিয়া সংকট (২০১১)।
    ৪. কুয়েত সংকট ১৯৯০ (ইরাক কর্তৃক আক্রমণ)।
    ৫. আফগান সংকট ১৯৭৯-১৯৮৯ (USSR কর্তৃক আক্রমণ)।
    ৬. আগ্রাসন-রোধ (ইরাক)।
    ৭. উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইরাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কিন্তু কাজে আসেনি।
    ৮. ২০০৩ সালে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করে।
- **বসনিয়া-হার্জেগোভিনা সংকট সমাধানে ব্যর্থ:** বসনিয়ার যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৭ এপ্রিল এবং শেষ হয় ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে। প্রায় চার বছর স্থায়ী এই যুদ্ধে মূলত বসনিয়ার মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালায় সার্বিয়রা। নির্বিচার গণহত্যা ও ধর্ষণ যুদ্ধজয়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে সার্বিয়রা। ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে এক লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে; বাস্তুচ্যুত হয় ২২ লাখ। ১৯৯৫ সালে যুদ্ধ শেষে সার্বীয়রা দেশের ৪৯ শতাংশ এলাকা দখলে সক্ষম হয় এবং এর নাম দেয় সার্ব প্রজাতন্ত্র। সার্বিয়রা ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সেব্রেনিয়া শহরটি দখল করে নেয়। জাতিসংঘের ৮১৯ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী নিরাপদ এলাকা সেব্রেনিয়ায় আশ্রয় নেওয়া কয়েক লাখ নিরস্ত্র মুসলমানের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালায় তারা। কিন্তু জাতিসংঘ তখন সার্বদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে ৮ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় গণহত্যা।

শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব (Uniting for Peace Resolution)

১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের সময় সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় একই বছরের ৩ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' [Resolution-377 (V)] গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ পরিষদকে গ্রহণ করতে হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ যদি ভেটো প্রয়োগের দরুন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ পরিষদ এক্ষেত্রে এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু:

১. শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য যদি নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিজের প্রাথমিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় অথচ শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসনমূলক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে সাধারণ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিকট যৌথব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে। শান্তি লঙ্ঘন এবং আগ্রাসনমূলক ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে সাধারণ পরিষদ সশস্ত্রবাহিনী ব্যবহার করতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের কোনো অধিবেশন না থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ জরুরি অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা যাবে।
২. 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব'-এ ১৪টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত শান্তি-পর্যবেক্ষণ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিশন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর বিশ্বের যে-কোনো অংশের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবে।
৩. প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের আহ্বানে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রে তাদের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা প্রয়াসে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকবে।
৪. 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব'-এ সব বিষয় পর্যালোচনা এবং তার ওপর প্রতিবেদন পেশ ও আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য ১৪টি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' সাধারণ পরিষদের এখতিয়ার সম্প্রসারিত এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট এবং হাঙ্গেরির সংকটে সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সুয়েজ খাল সংকট মোকাবিলা করার জন্য সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের জরুরি বাহিনী গঠন করে। ১৯৫৮ সালে জর্ডান এবং লেবাননের সংকট সমাধানের জন্য 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাব' অনুসারে সাধারণ পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পর্যন্ত ১৩ বার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সর্বশেষ ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' সনদের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কারণ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা এককভাবে সনদ প্রণেতাগণ নিরাপত্তা পরিষদকেই ন্যস্ত করেছে। 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য প্রস্তাব' কার্যকর করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫জন স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হয় না। এর ফলে একদিকে যেমন সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। তেমনি অন্যদিকে বৃহৎ শক্তির মধ্যে বিরোধের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। কারণ, ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি অনুসারে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলে তা কার্যকর করার জন্য কোনো সমস্যাই থাকে না। সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন।

গণহত্যা (Genocide)

পারিভাষিক অর্থে, গণহত্যা বলতে বোঝায় কোনো দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ভিন্ন মতাদর্শধারীদের খুন এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনকে। ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের গৃহীত UNGA 2603 Resolution অনুযায়ী, 'গণহত্যা বলতে বোঝায় এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে'।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের Genocide Convention এর ২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নিম্নোক্ত ৫টি অপরাধ গণহত্যা-

১. কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে মেরে ফেলা।
২. শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনো গ্রুপের মানুষদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করা।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে করে কোনো জাতি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গোষ্ঠীর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫. জোরপূর্বক কোনো জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের অন্য জাতিগোষ্ঠীতে প্রেরণ করা।

১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে গণহত্যা প্রতিরোধ ও এ সংক্রান্ত শাস্তি বিষয়ক Convention গৃহীত হয়, সে উপলক্ষ্যেই এই তারিখে আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এই দিবসটির মূল লক্ষ্য হলো, 'গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং গণহত্যায় মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করা।' এটি জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের নিজ জনগণকে গণহত্যার হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাদেরই। গণহত্যার উসকানি বন্ধ করা ও গণহত্যা ঘটলে তা প্রতিরোধ করা এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গণহত্যা সংক্রান্ত আইন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের দ্বারা সংগঠিত ইহুদি গণহত্যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘে গণহত্যা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব Resolution 96(1)-The Crime of Genocide গৃহীত হয় এবং গণহত্যা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), or Genocide Convention নামে গণহত্যার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাসহ একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে গণহত্যা রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা দেয়। এটিই ইতিহাসে গণহত্যাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রথম কোনো সর্বজনীন চুক্তি। এই আইনটি ১৯৫২ সালের, ১২ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার (Universal Human Rights)

সর্বজনীন মানবাধিকার হলো এমন কতগুলো অধিকার যা জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, মতাদর্শ নির্বিশেষে সব মানুষই জন্মগতভাবে পাওয়ার যোগ্য। এই অধিকারগুলো সর্বজনীন, অবিভাজ্য এবং আত্মনির্ভরশীল। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে (UDHR) প্রথমবারের মতো মানবাধিকারের এই ধারণা স্বীকৃত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে Cranston বলেছেন-মানবাধিকার হলো এমন এক অধিকার যা ন্যায়বিচার বা আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে ছিনিয়ে নেওয়া বা হরণ করা যায় না। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Decleration on Human Rights) গ্রহণ করা হয়। এটি কোনো বাধ্যতামূলক আইন নয় তবে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। এতে ৩০টি ধারা রয়েছে যেখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোর উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ এই ঘোষণার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং সংবিধান ও মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মানবাধিকারের তিনটি দিক:

১. **জাতীয় মানবাধিকার:** জাতীয় পর্যায়ে তথা কোনো দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব, সেই দেশের সরকারের উপর ন্যস্ত। যেমন- 'অত্যাচার, নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের অধিকার'।

২. **আঞ্চলিক মানবাধিকার:** ভৌগোলিকভাবে একই অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চুক্তি থাকতে পারে আঞ্চলিক সংস্থা বা সংগঠনের অধীনে। যেখানে সংশ্লিষ্ট নাগরিকরা মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে। The African Charter on Human and Peoples Rights একটি উদাহরণ।

৩. **আন্তর্জাতিক মানবাধিকার:** UDHR-এর Article-2 বলে যে, মানবাধিকারের একটি বিশ্বজনীন রূপ বা চেহারা আছে।

মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ

মানবাধিকার প্রশ্ন জাতিসংঘের তৎপরতার অন্যতম প্রধান একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং শান্তিরক্ষা থেকে শুরু করে উন্নয়ন কিংবা মানবিক ত্রাণ সহায়তা অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র যেটাই হোক না কেন, জাতিসংঘের সকল তৎপরতার মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র হিসাবে মানবাধিকার বিষয়টিকে গণ্য করা হচ্ছে। জাতিসংঘ নানাভাবে মানবাধিকার বিষয়টিকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট। যেমন-

- মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই-কমিশনার (UNHCR) সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের চেষ্টা করেন, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা তদন্ত করে।
- বন্দিমুক্তি কিংবা মৃত্যুদণ্ড রদ প্রভৃতির ন্যায় মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনার মহোদয় গোপনে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন।
- জাতিসংঘের এমন কিছু মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি আছে, যার বিধান অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার কোনো ব্যক্তি দেশে যদি কোনো প্রতিকার না পান তাহলে অভিযুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে আপিল জানাতে পারবেন।
- সচেতন ব্যক্তি এবং মানবাধিকার গ্রুপগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারকে অবহিত করে থাকেন। হাই কমিশনারের অফিস থেকে তখন অভিযোগের তথ্যাবলি জাতিসংঘের যথোপযুক্ত সংস্থা, শাখা বা প্রক্রিয়া বরাবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
- অফিসে একটি হট লাইন টেলিফোন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে [নং (৪১২২) ৯১৭ ০০৯২]।
- মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশন হচ্ছে একমাত্র সংস্থা যা বিশ্বের যেকোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে প্রকাশ্য জনসভা করতে পারে। এই দপ্তর সকল দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ গ্রহণ করে।
- জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন, মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন (যেমন নির্যাতন) প্রভৃতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করে দেন।
- এসব প্রচেষ্টায় মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের অফিস সহায়তা প্রদান করে। এই অফিস থেকে পৃথিবীর সকল দেশের সরকারসমূহের প্রতি মানবাধিকারের দায়িত্ব পালনের তাগিদ প্রদান করা হয় এবং পুলিশ প্রশিক্ষণ, আইনগত খসড়া প্রণয়ন এবং দণ্ডবিধি ও বিচার পদ্ধতির সংস্কারের সহায়তা প্রদানের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ক কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়।
- মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চয়তা বিধানকারী আইনকানুনকে এখন বহু ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সাবেক যুগোশ্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডায় সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুইটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধীদেরকে ন্যায়বিচারের আওতায় আনয়নে সহায়ক হয়েছে।
- শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

জেনেভা কনভেনশন ও এর মূল উদ্দেশ্য

জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention): জেনেভা কনভেনশন এক গুচ্ছ আন্তর্জাতিক চুক্তির সমষ্টি যা যুদ্ধের সময় আহত সৈন্য, বেসামরিক নাগরিক ও যুদ্ধবন্দিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এটি চারটি কনভেনশন এবং তিনটি প্রোটোকলের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রোটোকল-১ (১৯৭৭) : আন্তর্জাতিক যুদ্ধে সুরক্ষা বৃদ্ধি করা।
প্রোটোকল-২ (১৯৭৭) : অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বা গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
প্রোটোকল-৩ (২০০৫) : রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের পাশাপাশি রেড ক্রিস্টাল প্রতীক যোগ করে।

১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট বিশ্বের ৫৮টি দেশ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহতদের সঙ্গে আচরণবিধি ও সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে প্রথম তিনটি জেনেভা কনভেনশনের পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করা হয় এবং এতে চতুর্থ কনভেনশনটি যোগ করা হয়।

ক্রমিক	সাল	উদ্দেশ্য
প্রথম	১৮৬৪	যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
দ্বিতীয়	১৯০৬	সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
তৃতীয়	১৯২৯	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
চতুর্থ	১৯৪৯	যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য সম্পাদিত চতুর্থ কনভেনশনকে চারটি রেড ক্রস কনভেনশন নামেও ডাকা হয়।

১৯৪৯ সালে জেনেভায় যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণবিধি নির্ধারণের জন্য একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, যা চতুর্থ কনভেনশন নামে পরিচিত। এতে সাব্যস্ত হয় যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাদের ওপর কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না; বন্দি হওয়ার পরপরই তাদের বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে। জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি নির্বিশেষে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার সমান সুযোগ দিতে হবে। যেসব যানবাহন বা উড়োজাহাজ চিকিৎসা সরঞ্জাম বা আহতদের বহন করছে, সেসব যানবাহনের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। বন্দিকারীরা সাধারণ বন্দিদের (কর্মকর্তা পর্যায়ের নয়) যুদ্ধ বহির্ভূত কাজে লাগাতে পারবেন, তবে তা অমানবিক বা মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না ইত্যাদি।

UNHCR

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার বা United Nations High Commissioner for Refugees এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে UNHCR। UNHCR জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ বা কোনো দেশের সরকারের অনুরোধে স্বদেশহীন, বাস্তুহারা, বিতাড়িত, মাতৃভূমিচ্যুত শরণার্থীদের রক্ষা করা, তাদের অবস্থাকে সমর্থন জোগানো এবং নিজ দেশে ফেরা বা যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে UNHCR-এ রূপান্তরিত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাবলে এ সংস্থা বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের রক্ষা ও তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সংস্থাটির কার্যক্রমের ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক আইন ও মানদণ্ড এর মধ্যে রয়েছে ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক ১৯৪৯ সালের চারটি জেনেভা সনদ। শরণার্থী বিষয়ক মূল আইন হলো শরণার্থী মর্যাদা বিষয়ক সনদ। ১৯৫১ এবং এর প্রটোকল ১৯৬৭ এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক চুক্তি ও ঘোষণাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের রক্ষা এবং তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রদানের কারণে ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে দুই বার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়। UNHCR'র সদর দপ্তর-জেনেভা, সুইজারল্যান্ড এবং বর্তমান হাইকমিশনার বারহাম সালিহ (Barham Salih)।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনসমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার অগ্রগতি সাধনে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জাতিসংঘ সনদে নারীর সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণায় নারীর অধিকার বিধৃত হয়েছে। কাজেই নারী-পুরুষে সমতা বা সমান অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।

নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডো (CEDAW)

- CEDAW এর পূর্ণরূপ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদটি সিডো সনদ নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
- ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়।
- এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময় নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।
- সিডো সনদে ৩০টি ধারা আছে, যা নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে।
- প্রথম ১৬টি নারীর প্রতি বৈষম্য কত প্রকারের আছে তা আলোচনা করে।
- বাকি ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।
- বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশে বর্তমানে এ সনদটি কার্যকর আছে। [উল্লেখ্য: বাংলাদেশ CEDAW সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬(১)C ইসলাম ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বাংলাদেশ মানে না।]

নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে সিডো সনদের ভূমিকা

- নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি প্রতিষ্ঠিত।
- নারীর মানবাধিকার বিষয়টিও উঠে এসেছে।
- বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করা হয়েছে। এটি এই সনদে স্বীকার করা হয়।
- নারীর নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
- নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন

প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন হচ্ছে বিশ্বে নারীসমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীলনকশা যা চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এটি জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কমিশনের ৪৯তম অধিবেশনের ৩৬১ অনুচ্ছেদের এ খসড়া অনুমোদন করা হয়। এতে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে নীতিনির্ধারণী কাঠামো এবং বাস্তব পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য:

- লিঙ্গ সমতা অর্জন ও নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা বিলোপ করা।

বেইজিং সম্মেলন: ১৯৯৫ সালে বেইজিং সম্মেলনে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৮৯টি সদস্যরাষ্ট্রের নেতারা অংশগ্রহণ করেন। সদস্যরাষ্ট্রগুলো নারী উন্নয়ন নীতিমালার রৈখিক রূপরেখা হিসেবে 'প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন' পূর্ণ অনুমোদন করে এবং এর আলোকে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের তালিকা করা হয়। ক্ষেত্রগুলো হলো:

- দারিদ্র্য
- গণমাধ্যম
- স্বাস্থ্য
- নারীদের উপর নির্যাতন
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেশিনারি
- অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ
- মানবাধিকার
- ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত
- সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত
- শিক্ষা
- পরিবেশ ও উন্নয়ন
- কন্যাশিশু

এই দলিলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি বিষয়ে বর্তমান বিশ্বে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সরকার, কিছু সংস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর।

পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাহাজ থেকে দূষণ শতকরা ৬০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে; উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সীমান্ত বহির্ভূত দূষণ প্রশমিত হয়েছে; ওজোন স্তর বিধ্বংসী গ্যাস উৎপাদন করা থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থার মধ্যস্থতায় ১৭০টির মতো পরিবেশ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনের পর থেকে জাতিসংঘ পরিবেশকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক কর্মসূচি হিসাবে গণ্য করে আসছে।

- 'এজেন্ডা-২১' যা চূড়ান্ত করা হয় ১৯৯২ সালে, পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে (ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন), পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের একটি বৈশ্বিক রূপকল্প তুলে ধরা হয় এবং এই কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে বহু দেশ তাদের নিজস্ব ও স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত এক পর্যালোচনায় দেখা যায়- পানি, বনভূমি, বিশ্বের উষ্ণতা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।
- টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন 'টেকসই উন্নয়ন'এর জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছে। এ হলো এমন এক কর্ম উদ্যোগ যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়।
- পরিবেশগত চুক্তিসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কী না কমিশন তা পর্যালোচনা করে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত সরকার ও প্রধান বেসরকারি গ্রুপগুলোকে নীতি নির্ধারণীমূলক উপদেশ দিয়ে থাকে। অগ্রগতির মাত্রা নিরূপণকারী তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সরকারসমূহকে সাহায্য করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক বা আদর্শ প্রণয়নে কমিশন কাজ করে চলেছে। ১০০টিরও বেশি দেশ টেকসই উন্নয়ন কমিশন অথবা অনুরূপ সমন্বয়কারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।
- জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) পরিবেশের আরও উত্তম ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে মধ্যস্থতা-প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।
- জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি সংস্থাগুলো পরিবেশের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)- এর বৈশ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (Global Environment Monitoring System) মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল দূষণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ন্যায় পরিবেশগত মৌলিক বিষয়াবলির সূচক পর্যবেক্ষণ করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) পর্যবেক্ষণ করে ভূমণ্ডলীয় মৎস্য সম্পদের মজুত এবং সীমাতিরিক্ত মৎস্য সম্পদের মজুত এবং সীমাতিরিক্ত মৎস্য আহরণের বিপদ সম্পর্কে সরকারগুলোকে সাবধান করে। ১৩০টি দেশ থেকে নেয়া প্রায় ২০০০ বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (Intergovernmental Panel on Climate Change) কাজ হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহুপাক্ষিক ঋণের সর্ববৃহৎ উৎস।
- পরিবেশ রক্ষায় জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও প্রটোকলসমূহ-
  - Montreal Protocol (1987)
  - Kyoto Protocol (1997)
  - Cartagena Protocol (2000)
  - Paris Agreement (2015)
  - Convention on Biological Diversity etc.

*[বিশেষ দ্রষ্টব্য: পরিবেশগত এজেন্ডা **Conceptual**-এর সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]*

জাতিসংঘ মহাসচিব

মহাসচিব জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। সচিবালয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত। জাতিসংঘের মহাসচিব মূলত সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশেই কাজ করেন, তিনি কোনো দেশ বা সরকার প্রধানের নির্দেশে কাজ করেন না। যদিও মহাসচিব কোনো একটি দেশের নাগরিক কিন্তু ঐ দেশের প্রতি আনুগত্য দেখানোর কোনো সুযোগ তাঁর নেই। মহাসচিবের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে-

- তিনি সচিবালয়কে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন এবং সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করবেন।
- নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে তিনি সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।
- তিনি জাতিসংঘের বাজেট প্রস্তুত করেন। সেই সাথে সদস্য দেশগুলোর চাঁদা আদায় ও জাতিসংঘের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত।
- তিনি প্রতিবছর সাধারণ সভার নিকট জাতিসংঘের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।
- অছি অঞ্চল সম্পর্কে যে প্রতিবেদন মহাসচিবের কাছে পেশ করা হয়, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি ওইসব অঞ্চলের স্বাধীনতার ব্যাপারে জাতিসংঘের অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে অগ্রসর হবেন।
- তিনি বিশেষ সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ ও যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।
- তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।
- আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সকল রাষ্ট্রের কাছে মনোনয়নপত্র আহ্বান করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মহাসচিব শুধু একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাই নন, তাঁর দায়িত্ব ও ভূমিকা ব্যাপক। বলা যেতে পারে তাঁকে ঘিরেই জাতিসংঘের সকল কর্ম আবর্তিত হয়। তিনিই ঐ সংস্থার মুখ্য ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় তার ভূমিকাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচনের নতুন নিয়ম

জাতিসংঘের নবম মহাসচিব নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৬ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে। ঐদিন ভাইভার মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই শুরু হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রার্থীরা সাক্ষাৎকারের জন্য মুখোমুখি হন। জাতিসংঘের ৭৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মহাসচিব হতে আগ্রহী প্রার্থীদের সংস্থার ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করতে কেবল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়ার ভোটেই নির্বাচিত হতো। এ প্রক্রিয়া নিয়ে বহুদিন ধরে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা ছিল। মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অধিক স্বচ্ছতা আনার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের সম্মতিতে নতুন এ প্রক্রিয়ায় মহাসচিব পদে প্রার্থীদের আবেদন ও জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে হয়। পরে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর ২০১৬ সালেই প্রথম নারী প্রার্থীরা মহাসচিব পদের জন্য লড়াই করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে এখন অবধি কোনো নারী জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হননি।

মহাসচিব নির্বাচনের পরিবর্তনসমূহ

- **প্রথমত,** মহাসচিব পদে আবেদন প্রক্রিয়া পূর্বের ন্যায় নিরাপত্তা পরিষদেই হবে। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইও পূর্বের ন্যায় নিরাপত্তা পরিষদ করবে। তবে, পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদ শুধু যোগ্য একজন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করত। বর্তমানে যত জন যোগ্য তত জনকেই যোগ্য প্রার্থী ঘোষণা করবে।
- **দ্বিতীয়ত,** পূর্বে নারীরা মহাসচিব পদে প্রার্থী হতে পারত না। এখন থেকে নারীরা প্রার্থী হতে পারবে।
- **তৃতীয়ত,** পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদ প্রার্থী বাছাই করে একজনের নাম সাধারণ পরিষদে পাঠাত নিয়োগের সুপারিশের জন্য। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যতজন যোগ্য প্রার্থী ততজনের নাম, জীবনবৃত্তান্ত এবং সশরীরে সাধারণ পরিষদে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- **চতুর্থত,** পূর্বে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় Close door নীতি অনুসরণ করা হতো কিন্তু বর্তমানে Open-door নীতিতে সাধারণ পরিষদের প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে প্রার্থীর নাম ও প্রোফাইল (Profile) পাঠানো হবে এবং ৮ ঘণ্টার একটি সেশনে প্রার্থী তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করবে।
- **পঞ্চমত,** সাধারণ পরিষদ সব প্রার্থী থেকে ১ জনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ সেই সুপারিশ অনুমোদন করবে।

জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা

জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে যখন বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় ব্যস্ত তখন শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘের সফলতার পাল্লাকে ভারী করে তুলেছে। দ্বন্দ্ব নিরসনে রাষ্ট্রের কিংবা আঞ্চলিক শক্তির ব্যর্থতা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩টি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে-

i. অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা (Arms Embargo)
ii. অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Sanction)
iii. শক্তি প্রয়োগ (Use of Force)

সৈন্য প্রেরণে ৩টি শর্ত-

i. যে দেশে প্রেরণ হবে তার অনুমতি
ii. নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি
iii. যে দেশগুলো স্বেচ্ছায় সৈন্য প্রেরণ করবে তার সম্মতি

১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করে। এর পর থেকে বিশ্বের সব প্রান্তে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রাখছে। ১৯৪৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি আহ্বান করা হয়। যুদ্ধবিরতি পর্যালোচনা করার জন্য United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

- **নিরাপত্তা রক্ষায়:** কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতি যাতে যুদ্ধে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে, সেজন্য সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে। শান্তিরক্ষী বাহিনী ঐ অঞ্চলের একটি নিরাপত্তা দেয়াল হিসেবে কাজ করে।
- **ঐকমত্য স্থাপনে:** শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সব ধরনের বিবাদ মিটিয়ে সম্পূর্ণরূপে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।
- **মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন:** শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে মধ্যস্থতাকারী (Mediator) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, যাদের বাফার বাহিনীও বলা হয়ে থাকে। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা চলে আসে। যার ফলে নিজেদের মধ্যে সহাবস্থানের সৃষ্টি হয়।
- **নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা:** বিবদমান দুই দেশের মধ্যে যাতে যুদ্ধ লেগে না যায়, সেজন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বাহিনী বিরোধপূর্ণ সীমান্তে অবস্থান নেয়, যাতে দুটি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।
- **পর্যবেক্ষক দল:** সংঘাতময় পক্ষগুলোর মধ্যকার যুদ্ধবিরতি বা শান্তি চুক্তি তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম প্রধান কাজ। যুদ্ধবিরতি যথাযথভাবে পালন হয়েছে কী না, তা তদারকি করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মহাসচিবের কাছে প্রেরণ করা এ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা:** যে দেশে শান্তিরক্ষী সৈন্য প্রেরিত হয়, সে দেশের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ঐ বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এ বাহিনী বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা ও চুক্তির মাধ্যমে আইনের শাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে।
- **নির্বাচন সংক্রান্ত ভূমিকা:** এছাড়াও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। যেমন- নেপালের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত এবং যুদ্ধাস্ত্রের ক্রমাগত পরিবর্তন:** আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের থেকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অস্ত্রধারীদের কৌশল পরিবর্তন এবং শান্তিরক্ষীসহ অন্যান্যদের লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালনা করা শান্তিরক্ষা মিশনের কাজকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। সেই সাথে সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার আন্তঃসংযোগ এবং নতুন প্রজন্মের অস্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিয়েছে।
- **শান্তিরক্ষীরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে:** এমন সব জায়গায় শান্তিরক্ষীদের প্রায়ই যেতে হয় বা কাজ করতে হয় যেখানে অন্যান্য মানুষ বা জনসাধারণ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। ফলে প্রতিদিন শান্তিরক্ষীরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। এমন কোনো মাস নেই যে মাসে শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলা হয়নি।
- **রাজনৈতিক সমাধানের দুরূহতা:** আমরা অনেক গুলো দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর সমাধান বেশ কঠিন। UNOCL এবং UNMIL বন্ধ হবার পর অনেকগুলি মিশন দুর্বল রাজনৈতিক সমঝোতা, অসম্মতি ও স্থগিত শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। ফলে এই দ্বন্দ্বগুলো হতে বের হওয়া বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে।
- **জটিল এবং বিস্তৃত ম্যানডেট:** শান্তিরক্ষী মিশনকে দুরূহ কাজ এবং বিস্তর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিন্তু একই সময়ে আঞ্চলিক অংশীদারদের পক্ষে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সাহায্য প্রদান সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যার কারণে শান্তিরক্ষীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে না।
- **কর্মদক্ষতার ঘাটতি:** শান্তিরক্ষী মিশনের দেশগুলো দক্ষ কর্মীর ঘাটতিতে ভুগছে এবং তাদের নানা রকম সংস্কার প্রয়োজন। এসব দেশের সুসংগঠিত, প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মঠ বাহিনী দরকার। সেই সাথে নারীদের শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান আরো বাড়াতে হবে এবং যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও অন্যান্য অসদাচরণের জন্য অপরাধীদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।
- **চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ:** চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ শান্তিরক্ষা মিশনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। মাঠ পর্যায়ে সাড়াদানে ব্যাঘাত ঘটা এবং বেসামরিক লোকজনকে রক্ষার মতো কাজে বাধা প্রদানের ফলে শান্তিরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ছে। চলাচলে বাধার ফলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ ও নিরাপদে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং রসদ পরিবহণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক সময় অপরাধীদের দ্বারা UN এর সম্পদ এবং অবকাঠামো ধ্বংসের মতো ঘটনা ঘটছে।
- **দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অভাব:** দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অভাবে শান্তিরক্ষী কমিশনের কাজের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সবক্ষেত্র হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি শান্তিরক্ষা মিশন এর কাজকে বেগবান করবে।

জাতিসংঘ পানি চুক্তি

জাতিসংঘের 'Convention on the Protection & use of Transboundary Water Courses & International Lakes' হলো একটি বৈশ্বিক চুক্তি, যার লক্ষ্য সীমান্তপাড়ের নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানির যৌথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এই চুক্তি ১৯৯২ সালের ১৭ই মার্চ ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে জাতিসংঘের 'Economic Commission for Europe (UNECE)' দ্বারা গৃহীত হয় এবং ১৯৯৬ সালে কার্যকর হয়। প্রথমে এটি ইউরোপ, ককেশাস ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য ছিল। পরে ২০১৬ সালে এটি জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত করা হয়, ফলে এটি বৈশ্বিক পানি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণে পরিণত হয়। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হলো সীমান্তপাড়ের পানির ন্যায্য ও টেকসই ব্যবহার, দূষণ প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

মূলনীতি

- **সহযোগিতা:** অংশীদার দেশগুলোকে যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা, তথ্য বিনিময়, পর্যবেক্ষণ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুক্তি করতে হবে।
- **ক্ষতি না করা:** কোনো রাষ্ট্র এমন কার্যক্রম চালাবে না যা প্রতিবেশী দেশের পানিসম্পদে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে।
- **টেকসই উন্নয়ন:** এটি জাতিসংঘের ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা (SDG)'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে SDG-6 (পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন) এর বাস্তবায়নে সহায়ক।

এই কনভেনশনকে অনেক সময় ১৯৯৭ সালে 'UN Convention on the Law of the Non-Nevigational Uses of International Water Courses'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। তবে ১৯৯২ সালে এই Water Convention টি বাস্তব প্রয়োগে বেশি গুরুত্ব দেয়-দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা বাড়ানোর দিকে। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৫২টি দেশ এই চুক্তির অংশ হয়েছে। সাম্প্রতিক সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সিয়েরা লিওন ও বাংলাদেশ। চুক্তিটি UNICEF সচিবালয় দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর অধীনে বিভিন্ন Working Group কাজ করে যেমন- পর্যবেক্ষণ, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সীমান্তপাড়ের পানি নিরাপত্তা। সংক্ষেপে বলা যায়, এটি এক ধরনের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া যা আইনি কাঠামো, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সংলাপের প্লাটফর্ম সরবরাহ করে। এর লক্ষ্য হলো- পানি সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উজানের বাঁধ নির্মাণজনিত সংঘাত প্রতিরোধ করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ

এলডিসি

ষাটের দশকে স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি সামনে আসে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উন্নয়নশীল ও উন্নত-এই দুই শ্রেণিতে বিশ্বের সব দেশকে ভাগ করে থাকে জাতিসংঘ। তবে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আবার যেসব দেশ তুলনামূলক দুর্বল, তাদের নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হয়। ১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। মূলত এসব দেশ যাতে নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে, সে জন্য উন্নত দেশের পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশকে কিছু বাজারসুবিধা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্যতম শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা। বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, পূর্ব তিমুর, লেসেথো, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। ১৯৭১ সালের পর এ পর্যন্ত মোট ৮টি দেশ LDC'র তালিকা থেকে বের হয়েছে।

LDC থেকে উত্তরণ

দেশ	অন্তর্ভুক্তি	উত্তরণ	দেশ	অন্তর্ভুক্তি	উত্তরণ
বতসোয়ানা	১৯৭১	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪	নিরক্ষীয় গিনি	১৯৮২	৪ জুন, ২০১৭
কেপভার্দে	১৯৭৭	২০ ডিসেম্বর, ২০০৭	ভানুয়াতু	১৯৮৫	৪ ডিসেম্বর, ২০২০
মালদ্বীপ	১৯৭১	১ জানুয়ারি, ২০১১	ভুটান	১৯৭১	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
সামোয়া	১৯৭১	১ জানুয়ারি, ২০১৪	সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে	১৯৮২	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

এলডিসি থেকে উত্তরণের শর্ত

মাথাপিছু আয় হিসাবটি জাতিসংঘ করেছে এটলাস পদ্ধতিতে। সেখানে মূল্যস্ফীতিসহ বিভিন্ন বিষয় সমন্বয় করে তিন বছরের গড় হিসাব করা হয়। এলডিসি থেকে উত্তরণের শর্তসমূহ-

শর্ত সমূহ	মানদণ্ড
মাথাপিছু আয় (GNI)	১৩০৬ মার্কিন ডলার বা তার বেশি (২০২৫)
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি স্কোর
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (EVI)	৩২ বা তার কম স্কোর

Committee for Development Policy (CDP)

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) একটি সহযোগী ফোরাম হলো Committee for Development Policy (CDP)। এই কমিটি কোন কোন দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হবে, তা প্রাথমিকভাবে ঠিক করে থাকে। এ জন্য তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মূলত পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, মানবসম্পদ এবং মাথাপিছু আয় এই তিনটি সূচকের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন করা হয়। কোনো দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য সিডিপি প্রথমে ECOSOC-এ সুপারিশ পাঠায়। এরপর ECOSOC তা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। একটি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার সুপারিশ পেতে পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে নির্ধারিত তিন সূচকের নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে হয়। যেকোনো দুটি সূচকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় কিংবা মাথাপিছু আয় নির্দিষ্ট সীমার ৩ গুণ করতে হয়। সিডিপির সদস্যসংখ্যা ২৪। বাংলাদেশকে ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করার চূড়ান্ত সুপারিশ করেছিল জাতিসংঘ। কিন্তু কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছ থেকে বাড়তি সময় (Grace Period) চেয়ে নিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করবে।

উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে LDC থেকে উত্তরণের পরবর্তী প্রভাব/চ্যালেঞ্জ

- কোনো দেশ এলডিসি অর্থাৎ, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর বাণিজ্য সুবিধাগুলো হারাতে থাকে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা হ্রাস।
- ওষুধ শিল্পে ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত আইন মেনে চলতে হবে।
- আন্তর্জাতিক পরিসরে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস।
- বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রদত্ত বাড়তি শুল্ক আরোপ।
- স্বল্পসুদে ঋণ বা সফট লোন এর সুবিধা হ্রাস।
- জাতিসংঘ চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিক খরচ বৃদ্ধি।
- বাণিজ্য শুল্কের চাপের প্রভাবে ওষুধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১. জাতিসংঘ সনদ সম্পর্কে লিখুন। চলমান বৈশ্বিক সংকট নিরসনে জাতিসংঘ সনদের আলোকে কার্যকর কী কী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে?

০২. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা করুন। এর সংস্কারের প্রয়োজন আছে কী? আপনার মতামত দিন।

০৩. জাতিসংঘ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কী? আপনার মতে জাতিসংঘ সংস্কারের রূপরেখা ও জাতিসংঘ সংস্কারের বাধাগুলো উল্লেখ করুন।

০৪. জাতিসংঘে গৃহীত মানবাধিকার এজেন্ডাগুলো কী কী? মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করুন।

০৫. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র কী? বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সুরক্ষায় এ ঘোষণাপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. জাতিসংঘের অর্থ সংকটের কারণে বিভিন্ন দেশের চলমান শান্তিরক্ষা মিশনগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি কি বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে? আপনার মতামত দিন। ১৫

উত্তর: সম্প্রতি, জাতিসংঘ বিশ্বের ৯টি দেশ থেকে তাদের শান্তিরক্ষী মিশনে এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থ সংকটের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বলে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে জানা গেছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ১৩-১৪ হাজার শান্তিরক্ষী সেনা ও পুলিশ সদস্যকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে তাদের সরঞ্জাম ও বহু বেসামরিক কর্মীর চাকরি হারানোর আশঙ্কা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শান্তি রক্ষা তহবিলের ৮০০ মিলিয়ন ডলার বাতিল করায় মূলত এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে জাতিসংঘকে।

যেসব দেশকে প্রভাবিত করবে: শান্তিরক্ষী প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তে যেসব মিশন সরাসরি প্রভাবিত হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ সুদান, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, লেবানন, কসোভো, সাইপ্রাস, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, পশ্চিম সাহারা, ইসরায়েল-সিরিয়ার মধ্যবর্তী গোলান মালভূমি এবং সুদান-দক্ষিণ সুদানের যৌথ প্রশাসনিক অঞ্চল আবেই। মোট শান্তিরক্ষী সেনা ও পুলিশের প্রায় ২৫ শতাংশ তাদের সরঞ্জামসহ ফিরিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি মিশনে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক বেসামরিক কর্মীও এই সিদ্ধান্তের প্রভাবের মধ্যে পড়বে।

শান্তিরক্ষা মিশনের বাজেট: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যা পুরো তহবিলের প্রায় ২৬ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন, যার অবদান প্রায় ২৪ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থপ্রদান এখন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের বকেয়া ছিল ১৫০ কোটি ডলার। এখন আরো ১৩০ কোটি ডলার ডলার যোগ হওয়ায় মোট বকেয়া দাঁড়িয়েছে ২৮০ কোটি ডলারে।

বাজেটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব: ২০২৫-২৬ সালে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের মোট বাজেট ছিল ৫৪০ কোটি ডলার। এর মধ্যে অনুদান হিসেবে ১৩০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখন জাতিসংঘকে জানিয়েছে, তারা বাজেটের অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার দেবে। এর মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার বরাদ্দ থাকবে হাইতির অ্যান্টি-গ্যাং মিশনের জন্য; যা জাতিসংঘের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। জাতিসংঘকে যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু বেশ ভালো একটি অঙ্কের অর্থ প্রদান করে থাকে তাই তাদের সিদ্ধান্ত সবসময়ই শান্তিরক্ষা মিশনে বেশ বড় একটি প্রভাব ফেলে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসে পাঠানো এক বার্তায় ২০২৪-২৫ সালের জন্য বরাদ্দ করা প্রায় ৮০ কোটি ডলারের শান্তিরক্ষা তহবিল বাতিল করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের বাজেট অফিস ২০২৬ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন সম্পূর্ণ বাতিলের প্রস্তাবও দিয়েছে। তাদের যুক্তি, মালি, লেবানন ও কঙ্গোতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযোগ নিচ্ছে। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিদেশি সহায়তায় ব্যাপক কাটছাঁট করছেন তিনি।

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি: জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বর্তমানে সামগ্রিকভাবে সংস্থাটির ব্যয় কমানো ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর উপায় খুঁজছেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘ তার ৮০তম বছরে প্রবেশ করছে এমন এক সময়, যখন নগদ অর্থের সংকট চরমে পৌঁছেছে, এর ফলে কেবল শান্তিরক্ষা মিশনই নয়, জাতিসংঘের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা প্রকল্পগুলোও আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে।

বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উপর প্রভাব: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও বলকান অঞ্চলে সংঘাত প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার শান্তিরক্ষী বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সেনা ও পুলিশ সদস্যরাও রয়েছেন। কিন্তু অর্থ সংকটে এই মিশনের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে অন্তত ১৩১৩ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘ।

ওয়াশিংটনের বকেয়া অর্থ পরিশোধে বিলম্ব এবং ভবিষ্যৎ অর্থায়ন স্থগিতের ফলে জাতিসংঘের আর্থিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ফলে শুধু শান্তিরক্ষা কার্যক্রমই নয়, জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক সম্পর্ক ও নতুন উত্তেজনার মুখে পড়েছে। গুতেরেসের কার্যালয় জানিয়েছে, সংস্থাটি ন্যূনতম খরচে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বিকল্প অর্থায়নের উৎস খুঁজছে। তবে তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হবে কিনা সেটা এখনও অনিশ্চিত। অর্থাভাব ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকোচনের মুখে পড়তে যাচ্ছে। এই পদক্ষেপ শুধু হাজারও শান্তিরক্ষীর জীবনে নয়, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলের লাখো মানুষের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার উপরে গভীর প্রভাব বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ। কারণ শান্তিরক্ষা মিশনগুলো শুধু সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে নিরাপত্তা বজায় রাখেনি, বরং মানবিক সহায়তা, নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এখন সেই কাঠামো সংকুচিত হলে বহু এলাকা আবারও সহিংসতার ঝুঁকিতে পড়বে।

শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ: 'নীল হেলমেট' পরে বিশ্বশান্তির মঞ্চে বাংলাদেশের পথচলা শুরু ১৯৮৮ সালে। ওই বছর জাতিসংঘের ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক মিশনে ১৫ জন সদস্য পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ১০ দেশে শান্তির পতাকা হাতে নিয়োজিত আছেন ৪৪৪ নারীসহ ৫ হাজার ৬৯৬ শান্তিরক্ষী (গত ৩১ আগস্টের হিসাব)। বিশ্বশান্তি রক্ষার এ যাত্রায় গত ৩৫ বছরে জীবন দিয়েছেন ১৭৪ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫৭ জন। পেশাদারির মাধ্যমে শান্তি রক্ষা মিশনে সেনা প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশ তৃতীয় শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) তথ্যানুযায়ী, তিন দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা ৪৩টি দেশ ও স্থানে ৬৩টি জাতিসংঘ মিশন সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এ দীর্ঘযাত্রায় সশস্ত্র বাহিনীর অন্তত ১ লাখ ৭৮ হাজার ৭৪৩ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে ১০টি দেশ বা স্থানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এগুলো হলো সুদান ও দক্ষিণ সুদানের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল আবেই, মধ্য আফ্রিকা, সাইপ্রাস, কঙ্গো, লেবানন, দক্ষিণ সুদান, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল পশ্চিম সাহারা, ইয়েমেন, লিবিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর।

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলেছে, মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কূটনৈতিক পর্যায়ে বিকল্প তহবিলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছ থেকে সীমিত সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান বন্ধ হলে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি তৈরি হবে।

০২. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ১৫

উত্তর: জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। যুদ্ধ, আগ্রাসন, শান্তিভঙ্গ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে ন্যস্ত। তবে বাস্তবতা হলো, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিদের অধিকার লঙ্ঘন, অবৈধ দখলদারিত্ব, বসতি স্থাপন ও মানবিক সংকট সত্ত্বেও কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন-নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রায়ই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা অবস্থান এবং ইসরায়েলের পক্ষে ভেটো প্রয়োগের ফলে বহু প্রস্তাব বাতিল হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনিদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো ও কার্যপ্রণালী সমান ও ন্যায়সংগত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় গঠিত এই কাঠামো বর্তমান বহুমাত্রিক ও বহুধ্রুববিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে ভেটো ক্ষমতা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। ফলস্বরূপ, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট কেবল একটি আঞ্চলিক সমস্যা নয়; এটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটকেও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার-বিশেষ করে ভেটো ক্ষমতা সীমিত করা বা পুনর্বিবেচনা করা-অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিশ্লেষকগণ নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে নিম্নোক্ত সংস্কার দাবি করেন-

১. **নিরাপত্তা পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা:** বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি রাষ্ট্র জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করে না। তথ্য বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯.৪ শতাংশ ইউরোপে কিন্তু প্রতিনিধিত্ব হলো শতকরা ৬০ ভাগ। অন্যদিকে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭ ভাগ এশিয়ার, প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২০ ভাগ। তেমনিভাবে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব খুবই নগণ্য। আর তাই নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার জরুরি।

২. **সাধারণ পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করা:** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদই হলো জাতিসংঘের সর্বজনীন সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র। সকলের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটোর কারণে সাধারণ পরিষদ তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। আর তাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করা উচিত।

৩. **নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার প্রেক্ষিতে মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি:** মহাসচিব জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি। তবে তিনি নিরাপত্তা পরিষদ ও বৃহৎ শক্তিসমূহের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি।

৪. **সদস্যের অনুপাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা:** জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি রাষ্ট্র। এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৫১টি। প্রতিষ্ঠাকালীন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১টি যার মধ্যে ৫টি ছিল স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী। কিন্তু ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের ২৩ ধারা সংশোধন করা হয়। এরপর থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হয় ১০টি। এরপর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। আর তাই বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার করা জরুরি।

৫. **বৃহৎ শক্তিসমূহের মোড়লিপনার ক্ষমতা হ্রাস করা:** জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহের মোড়লিপনার কারণে বিশ্ব-নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হচ্ছে। আর তাই নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের মাধ্যমে জাতিসংঘের দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতায়ন ও বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রভাব হ্রাস করা সময়ের দাবি।

৬. **শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিবাদের মীমাংসা:** আন্তর্জাতিক মহলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি কারণে সংঘাত ও বিবাদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ভেটো ক্ষমতার অপপ্রয়োগের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয় না। কিংবা হলেও তা দীর্ঘসূত্রিতায় পর্যবসিত হয়। আর তাই ভেটো ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার করা উচিত।

৭. **জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন:** জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতা এসকল সদস্যকে আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধ্বে উঠার সুযোগ করে দেয়। ফলে আন্তর্জাতিক মহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনৈক্য দেখা দেয়। আর এটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করে। আর তাই আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার করা দরকার।

৮. **ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাস:** ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাসকল্পে ভেটো প্রাপ্ত কোনো সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ী হলে ভেটো সিদ্ধান্ত অকার্যকর হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ২৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা জরুরি।

সবশেষে বলা যায়, যদি জাতিসংঘ সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতীক হতে চায়, তবে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত বৈষম্য দূর করে আরও গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে এগোতে হবে। নতুবা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের মতো বিষয়গুলোতে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাবে।